শিকারী

(গল্পগ্রন্থ – কুশল পাহাড়ি)

জংলী দেহাতী বালক মাগনিরাম। রামজীর কাছে মেগে ওকে।নাকি কোলে পাওয়া গিয়েছিল। এরা ভগবানের কাছেও মানুষের কাছে বিনয় প্রকাশ করতে অভ্যস্ত, তাই বৈশ্য-বণিকদের মতো কুরুচি প্রদর্শন করে না ছেলের 'লাখপতিয়া' 'দৌলতরাম' প্রভৃতি নাম রেখে।

ঝাঁপড়িশোল গ্রামে ওর বাড়ি।

মোটরের রাস্তা থেকে বাঁদিকে বেরুনো সরু রাস্তা। এইরাস্তার কিছু দূরে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের শিমুল গাছের আবাদ। প্রায় তিন-চার একর জমিতে শুধু দেড়শো-দুশো শিমুল গাছ।ফাল্গুন-চৈত্রে ফুল ফুটলে কি অদ্ভুত দেখায় রাস্তা থেকে ! নিষ্পত্র বড় বড় গাছগুলিতে আগুন-রাঙা পাপড়ি জ্বলচেশিমুল ফুলের।

শিমুল গাছের আবাদ পার হয়ে একটা নদী, নাম বরজোর নালা, বড় বড় শিলাখণ্ডের পাষাণ-বাঁধানো তটভূমির ওপর ছায়ানিবিড় বনপাদপশ্রেণি, তাদের তলা দিয়ে বর্ষার জলে ফুলে ফেঁপে দ্বিগুণ হয়ে বরজোর নালা ছুটে চলেচে অদূরবর্তী শঙ্খনদীর দিকে। শঙ্খ নদী আবার মহাডালপাহাড় শ্রেণীর তলায় গিয়ে মিশেচে মহানদীর সঙ্গে। সেটা কোথায় গিয়েচে, ঝাঁপড়িশোল গাঁয়ের লোক অত খবর রাখে না। বরজোর নালাপার হয়ে চুকুরদি-তুরুকদি রিজার্ভ ফরেস্ট। চুকুরদি একটাখ্রিস্টান গ্রামের নাম, গ্রামের মধ্যেই ওদের পুরু কর্কশ সাবাই ঘাসে ছাওয়া ধাওড়া চালাঘরের গীর্জা। দেওয়ালের শালকাটির ফাঁক দিয়ে উঁকি মারলে দেখা যাবে একখানা মাত্র টিনের ভাঙাচেয়ার, গীর্জাঘরের একমাত্র আসবাব। বগোদর থেকে মাসে একবার পাদ্রি সাহেব এসে এদের নিয়ে উপাসনা করেন ওশাস্ত্রকথা বলেন, তার জন্যেই এই চেয়ারখানা যোগাড় করাআছে।

চুকুরদি গ্রাম পেরিয়ে মহাডাল পাহাড়ের তিনশোফুট একটা শাখা পার হয়ে, একটা বৃদ্ধ মাদার গাছ পার হয়েবনবেষ্টিত বনকাটি গ্রাম।মাত্র ছাব্বিশ ঘর লোকের বাস, কোলও মুন্ডা জাতীয় লোক, এরা খ্রিস্টান নয়।

গ্রামের বাইরে এদের বড় বড় শালগাছের মধ্যেবোঙ্গাপূজার স্থান।

মারাং বোঙ্গা অর্থাৎ সূর্যদেবের উদ্দেশে এখানেমুরগীবলি দেওয়া হয়, গাঁয়ের সবাই বছরে একদিন বেঁধে খায়। হাড়িকুঁড়িফেলে যায় বোঙ্গাতলার এক পাশে। বছর বছর জমেচে পুরনোহাড়ির পাহাড়।

বনকাটি গ্রামের পরে মাঙ্গনবেড়া, মাঙ্গনবেড়ার পরেঝাঁপড়িশোল।

এত কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে,ঝাঁপড়িশোল গ্রাম যে রিজার্ভ ফরেস্টের ছায়াময় নিবিড়তার কোথায় কতদূরেলুকোনো, সেটা বোঝা যাবে।

এই গ্রামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চাইলেদেখা যাবে, চক্রাকারে নীল শৈলমালা, মহাডাল, কাট্চুরি, নানকাঁসবাহাল, সয়ছুরি ও চুকুরদি পাহাড় (যেটার উচ্চতাআগেই বলা হয়েচে) এ ক্ষুদ্র গ্রামকে ঘিরে রেখেছে। জারুলফুল ফোটে বর্ষাকালে, করমগাছের হলদে ফুল ঝরে পড়েথাকে বনতল বিছিয়ে, ধনেশ পাখি ডাকে, কেকারব করেবনশীর্ষে ময়ূরের দল।

মাগনিরাম ষোল বছরের ছেলে। ম্যালেরিয়ায় ভুগে রোগা শরীর। এই সব জংলী গ্রামে বর্ষাকালে ম্যালেরিয়া একবার যাকে ধরে, তাকে একেবারে কোথায় যে নিয়ে গিয়ে*ফেলে* ! এ গ্রামের অধিকাংশ লোকের কিন্তু সুন্দর সুগঠিত দেহ, পাথরে খোদাই করা মূর্তির মতো। মেয়েরা পুরুষদের চেয়েওসুঠাম, সাবলীল—অধিকাংশ মেয়ের মুখই যেমন সরল তেমনিসুন্দর।

মাগনিরাম আজকাল অন্যমনস্ক হয়ে থাকে সর্বদা।নিজের অসুখের জন্যেই বোধ হয়।

বন্ধু নন্‌কুয়া এসে বললে—চল মাছটা ধরে আনি—

মাগনিরাম রাগের সঙ্গে বললে—নাই যাবো

—কেনে ?

—উদাস লাগচে মাথাটা।

—দুখাচ্চে ?

-না হে, উদাস লাগচে। উ কথায় তোর কি কাম ?নাই যাবো, ভাগি যা।

-কেনে ভাগবে ?ইঃ !

—দিখাবো তোকে ?দিখ্‌বি ?

কাঁড় ধরবার হাত্তি নি, দিখাবি কুথা থিকে ?উ অতসোজা ?

—ভাগি যা !

—নাই যাবো।

মাগনিরাম রাগের সঙ্গে একটা ঢিল ছুঁড়ে মারলে। নন্‌কুয়া হাসতে হাসতে পালিয়ে গেল।

পালিয়ে ঠিক নয়, চলে গেল বলাই সঙ্গত। ম্যালেরিয়াজীর্ণ মাগনিরামকে কে বা ভয় করবে ওদের মধ্যে।

মাগনিরাম সেই দুঃখেই উদাস মনে থাকে আজকাল।

বরজোর নালা ঘুরে ঝাঁপড়িশোলের নিকট দিয়েইগিয়েচে , সিকি মাইল দূরে একটা বন পার হলেই। এই নালার ধারে বনের ওপারে গ্রামের লোকেরা বর্ষাকালে কান্দা আলুতুলতে যায়। কান্দা আলুর বড় লতা শাল আসান অর্জুনগাছের গা বেয়ে অনেক উপরে উঠে যায়, সেই অত উঁচুতেযেখানে বনের ময়ূর নৃত্য করে বর্ষার মেঘ পাহাড়ের শিখরেজমলে—সেখানে ফুটে থাকে কান্দা আলুলতার নীল ফুল।

মাগনিরাম সে ফুল দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়, কিন্তু অত উঁচুতেউঠে ফুল সংগ্রহ করতে পারে না বলে গ্রামের মেয়েরা তাকে ক্ষেপায়, দোষ ধরে, মানুষ বলে ভাবে না।

তারা বলে—কমজুরী লোকটা হে, উ উসব কামেরলয়—

ও উত্তর দেয়—গায়ের জুর লা আছে তো কি করচে ! তুদের মনটা নেই যে হে—

বুধনী হেসে বলে—মনে কি করবে ?

—উ তোদের বুঝাতে লারবো। জাহিল লোকদেরবুঝাবো কি হে !

—উঃ, ভারি জাহিল জাহিল করতে এসেছে, বড়পণ্ডিতটা আছে তাই দিখাতে এসেছে—ভাগিযাঃ !

—তু ভাগি যা।

ওরা রাগ করে—তুর ঘরে চাউল সিঝাই না মকাই মাগ্‌নিকরি যে ভাগি যাবো ?

এবার মাগনিরাম হাসে। মেয়েদের রাগ দেখে ওর হাসি পায়। বলে—যা যা হুজুমে চালাকানা—ঠ্যাঙাকানা দো—

এ কথার মানে, না গেলে লাঠি মারবো। মেয়েরা রেগে গালাগালি করে আরো। ও হাততালি দিয়ে হাসে। বলে—বিজলি চম্‌কাও কানা দো—

অর্থাৎ আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্চে। ও চমৎকার গান বাঁধেসেদিনটা বিদ্যুৎ চমকানো নিয়ে। নিজেই গায়। এবার মেয়েরামন দিয়ে শোনে। ওর ওপর তাদের রাগ ও বিতৃষ্ণা অনেকখানিচলে যায়। বোঙ্গা পরবের সময় ও নিজের বাঁধা ছড়া ও গান নিজের বন্ধু নন্‌কুয়া ও ছোট বোন রতুকে শেখায়।

আসলে মাগনিরাম হল কবি।

কবির বংশও বটে, ওর বাবা জাতে সাঁওতাল, কিন্তু রাঁচি শহরে কিছুদিন ছিল। সেই জন্যেই ওর ছেলের নাম মাগনিরাম নতুবা সাঁওতালের ছেলের নাম মাগনিরাম হত না। রামভক্তি সে বিদেশ থেকে এই নিবিড় বনপ্রদেশে আমদানি করেছিল।

ওর বাবা এদেশে একজন বিখ্যাত লোক। রাঁচি শহরেসে মোটর গাড়ি দেখেচে, টেলিফুঁক দেখেচে, বিজলি বাতি, বিজলি পাখা, কলের গান—কত কি দেখেচে ! আজ বছরসতেরো আগেকার কথা। সতেরো বছর ধরে সেই গল্প ভাঙিয়ে খাচ্চে বাড়ি বসে। গ্রামের লোকদের সে অবজ্ঞার চোখে দ্যাখে, বলে—সে দুনিয়াটার কি দেখলি রে ?কুথা নাগেলি, শরীরটার সক্কত হবে কুথা থেকে হে ?মনের সক্কত হবেতবে তো শরীরটাতে লাগবে।

ওর কাছে সবাই আশ্চর্য গল্প শুনতে আসে। কত রকমপরামর্শ করতে আসে। ছেলেটিও বাপের ধারা পেয়ে বসে আছে। দুনিয়া সংসারের কোনো কাজে লাগে না। বসে বসেকবিতা বানায় আর গান বাঁধে। এদিক থেকে সে বাপের চেয়ে এক কাটি সরেস হয়েচে, বলাবলি করে গ্রামের লোকেরা। অবিশ্যি নিন্দা হিসাবেই বলে, প্রশংসা করে নয়।

মানগনিরামের মন ওড়েকান্দালতার নীল ফুল যেখানে ফুটেচে, সেই বনের মাথার ওপরে। বাবাকে সে বড় মানে; বাবা একজন কত বড় লোক। কত দেশ ঘুরেচে। এখানকারজাহিল লোকেরা কি করে বুঝবে তার বাবা কত বড় ?

সে যদি জ্বরে না ভুগতো তবে অনেকদূর চলে যেতো এতদিনে—একবার সে গরমিন্টোর শিমুল গাছের আবাদদেখতে গিয়েছিল, সেখানে তার কয়েকদিন আগে গরমিন্টোএসেছিল আবাদ তদারক করতে। গরমিন্টো মিঠাই ফেলেগিয়েছিল, বিলাইতি মিঠাই, লাল নীল রং, কাগজে মোড়া। সেকুড়িয়ে প্রথমে ভাবলে, কি এগুলো ?

আবাদের চৌকিদার দেখে বললে—ও বিলাইতি মিঠাই, খেয়ে লাও—

সে মুখে দিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল। অমন সে জীবনেকখনো খায়নি। গরমিন্টোর মিঠাই ভারি চমৎকার লাগে খেতে।

এ সব ফেলে সে চলে যেতো যে দেশে ঐ রকম আশ্চর্যজিনিস আছে, কিন্তু বাবার জন্যে মন কেমন করলে দূরে কি করে যাওয়া হয় ?তা ছাড়া শরীরে অসুখ তো লেগেই আছে, যে জন্যে সে গাছের ওপরে উঠতে পারে না, কাঁড় ধরতে পারেনা, পাহাড় ডিঙিয়ে বড় ঝোপের বনে যেতে পারে না। কিন্তুবাবার মতো সে নামকরা লোক হতে চায়, বাবার মনে সুখদিতে চায়।

বর্ষার বাজরাক্ষেতে যেমন প্রতি বছর পাহাড় থেকেবন্যহস্তিযূথ নামে, ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে, এবারও তারব্যতিক্রম ঘটলো না।

ঘাটোয়ালী কাছারি থেকে ঢেঁটঁরা দিয়ে গেল, এবার মস্তবড় পাগলা হাতি নেমে বন্য গ্রামগুলির অত্যন্ত ক্ষতি করচে।যে হাতি মারতে পারবে, তাকে একশো টাকা পুরস্কার দেওয়াহবে।গ্রামের মধ্যে জোয়ান শিকারীর দল চঞ্চল হয়ে উঠলো, কিন্তু কেউ কারো সঙ্গে পরামর্শ করে না, পাছে তার মতলবঅপরে আত্মসাৎ করে।

ঢেমন সাঁওতাল বনকাটি গ্রাম থেকে এসে একদিন সবাইকে ডেকে বললে—এ বছরের হাতিটি তুরা মারতেলারবি।

সবাই বললে-কেনে হে ?

—উ মাদী হাতি আছে, মারতে লারবি।

একজন যুবক শিকারী বললে—কাঁড় টেনে হাতি মারানেই যাবে ?তুমি শিখাতে এসেচ ?মাদী হাতিটা কি হাতি লয় ?

—ই সে হাতি লয়। দেখে লিবি আমার কথা। এ বছরদু'তিন আদমি মরবেই সব বস্তির। ঘাটোয়ালী কাছারির লোকটাকা দেবে সিধা বাত শুনে ?তা দিবে না। দেখে লিবি।

ঢেমন বড় শিকারী এ অঞ্চলের। একা বাঘ মেরেচে কাঁড়দিয়ে। বিষাক্ত ফলা চালিয়ে হাতি মেরেচে। তার কথা অগ্রাহ্যকরবে এমন লোক এ দিকের কোনো গ্রামে নেই।

মাগনিরাম সেখানে উপস্থিত ছিল। সে ঢেমন সাঁওতালের সুগঠিত চেহারার দিকে চেয়ে দেখলে প্রশংসার দৃষ্টিতে। মরদ বটে একজন। আজ তার যদি জ্বর না হত, সেও অমনি হতেপারতো। তার বাবা বুড়ো হয়েচে। বাবার হাত থেকে কাজনিতে হবে এবার তাকে। বাবাকে সুখে রাখতে হবে।

মাগনিরাম কবির দৃষ্টিতে জগৎটাকে দেখে। বাবাকেসাহায্য করতে হবে, সুখী করতে হবে, এটা হল কল্পনাপ্রবণহৃদয়ের কথা। কিন্তু বাইরের দুনিয়াটা শুধু কল্পনাতে চলে না।কল্পনাকে কার্যে পরিণত করবার কৌশলও শেখা দরকার।মাগনিরাম সেখানে নিজেকে অসহায় বোধ করে।

কতদিন একলা বসে বসে কি ভাবে সে-ই জানে।

বাবা কত বড় হয়ে যাবে একশো টাকা পেলে। কাড়াকিনবে। কাড়ার দুধ খাবে। গরমিন্টোর মিঠাই আনিয়ে খাবে দুজনে। তার মা কবে মারা গিয়েচে ছেলেবেলায়, তার মনেওপড়ে না। বাবা তাকে মায়ের মতো করে মানুষ করেছিল। এখনসে যদি বাবাকে না দেখে, কে দেখবে ?

সেদিন সে শুনলে নিমপুরা আর বরজোর নালার ধারে রোজ রাত্রে পাগলা হাতিটা নামচে। মাগনিরাম কাউকে কিছু নাবলে বিকেলের দিকে একাই চলে গেল বরজোর নালার ধারে।

বর্ষায় বরজোর নালার কূল ছাপিয়ে জল উঠেচে এপারে বাজরা ক্ষেতে। ওপারে পাহাড় সুতরাং জল সেদিকে না বেড়েএই কুলকেই ভাসিয়েছে। বাজরা ক্ষেতে হাতির পায়ের দাগ সর্বত্র, ক্ষেত তচনচ করেচে হাতি।

সুমুখ জ্যোৎস্না রাত। মাগনিরাম ঢেমন সাঁওতালকে অনেক খোশামোদ করে দুটি বিষমাখা শলা সংগ্রহ করেছে।বাঁশের চোঙায় ফুঁ দিয়ে সেই বিষমাখানো শলা কি ভাবে ছুঁড়তেহয় সেটা সে দু-একবার দেখে নিয়েচে বটে, কিন্তু নিপুণ হাতেচালায় যারা, তারাই শলা চালাতে ইতস্তত করে, আনাড়িমাগনিরামের কথা তো অনেক দূরের !

মাগনিরাম বরজোর নালার ধারের একটা কুলগাছে উঠেবসে রইল সন্ধ্যার আগে থেকেই। আপন মনে গুন্‌গুন্‌ করেগান করতে লাগলো। যদি আজ হাতিটা নামে !

অনেক রাত্রে সত্যি নামলো পাগলা মাদী হাতিটা। হাতি নয়, সাক্ষাৎ শমন ! আজই সন্ধেবেলা এই খানিক আগে নিমপুরার একটি বুড়ো ক্ষেতপাহারাদারকে খুন করে এসেচে,তার শুঁড়ে তখনো টাটকা রক্তের দাগ।

মাগনিরাম উত্তেজিত হয়ে উঠলো। একশো টাকা রোজগার করে বাবাকে আনন্দ দেবার চরম মুহূর্ত সমাগত। দেরি করলে চলবে না।

ঠিক যখন হাতিটা বরজোর নালার ধারে কুলগাছেরপাশে এসেচে, মাগনিরাম বাঁশের চোঙে ফুঁ দিয়ে শলা ছুঁড়লো।

এর পরের ঘটনা টের পাওয়া গেল সকালবেলা।

বাজরা ক্ষেতের মধ্যে তিন জায়গায় মাগনিরামের দেহের তিনটি রক্তাক্ত থেঁৎলানো টুকরো। কিন্তু মাগনিরামের বাবাকে একশো টাকা দিয়েছিল ঘাটোয়ালী কাছারি থেকে।

কেন, তা বলি।

বরজোর নালার ওপারে সরকুন্দা জঙ্গলের কিনারায় প্রকাণ্ড পাগলা হাতিটামরে পড়ে আছে—আবিষ্কার হল তিনদিন পরে। হাতিটার নাকের দুপাশে তখনো দুটো শলা গেঁথে ছিল। ঢেমন সাঁওতাল বীর শিকারী,শলা দেখে

বললে—ই তো আমার হাতের শলা আছে হে ! বাসুড়ির ছেলেটা আমার কাছ থেকে লিয়েছিল সেদিন। ওর মনেই ছিল, সেটা কি করে জানচি হে ?

ঢেমন সর্দারের সাক্ষ্যের বলে ঘাটোয়ালী কাছারির পানিকর মাগনিরামের বাবাকে কাছারিতে ডেকে চারজন সাক্ষীর সামনে টিপসই নিয়ে নগদ দশ টাকার দশখানা নোটওর হাতে তুলে দিয়ে বললে—বাপের বেটা তো ইকে বোলে ! চোখের জল না ফেল্‌বি, উ তোর বেটা ছিল না, তোর বাবাছিল হে।